ক্ষমতার জন্য ইসলামের নামে মিথ্যাচার করেও ব্যর্থের পথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইসলামপন্থী-ধর্মান্ধ-ধর্মবেত্তারা !

॥ সাহেব ॥

জ্ঞানহীন ধর্মান্ধ উগ্রবাদীদের বর্তমান অবস্থানে বাংলাদেশে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের উপর বিভিন্ন স্থানে জঙ্গি আক্রমণের ঘটনার প্রেক্ষিতে জোট সরকারের অঙ্গদল জামাতে ইসলামের এক নেতার সাম্প্রতিক উস্কানীমূলক রাজনৈতিক ইসলামি বক্তব্য আহমদীয়াদের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয় বলে চিন্তাবিদরা মনে করছেন। এ ধরনের বক্তব্য ধর্মান্ধ উগ্রবাদীদের আরো অনুপ্রেরণা যোগাবে এবং দেশের মধ্যে আরো বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারে বলে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত।

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সদস্যরা হঠাৎ করে বাইরে থেকে আসা কোনো লেজকাটা সম্প্রদায় নয়। তারা এ দেশেরই সন্তান। আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন। আমরা ইচ্ছা অনিচ্ছায় তাদের সাথে যুক্ত। কারো ভাই আহমদী, কারো ফুফা, কারো বোন, কারো বাপ আবার কারো পুত্র। এভাবেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আহমদীয়াদের অস্তিত্ব। জামাতে ইসলামের রোকন পর্যায়ের সদস্যদের মধ্য থেকে খোঁজ নিলেও এ ধরনের সম্পর্কশীল একাধিক রোকন কর্মী নেতা পাওয়া যাবে। এর বাস্তব প্রমাণ মৌদুদি সাহেবের 'কাদিয়ানী সমস্যা' বইটি থেকেই পাওয়া যায়। কাদিয়ানী সমস্যা বইটিতে জামাতেরই এক সদস্য মৌদুদি সাহেবকে আহমদীয়াদের বিভিন্ন অকৃত্তিম আচরণের উল্লেখ করে প্রশ্ন করেছিলেন এই মর্মে যে, তাদের অকৃত্তিম আচরণে এটা মোটেই বিশ্বাস হয় না যে, তারা কোনো মিথ্যাবাদীকে অনুসরণ করছে। তখন মৌদুদি সাহেব আল্লাহকে দায়ী করেই বলেছিলেন, যদি এমন হয় তবে কেয়ামতের দিন আল্লাহকে দায়ী করা ছাড়া আর আমাদের কোনোই উপায় থাকবে না। আল্লাহকে দোষী করে নিজেকে দোষমুক্ত করার অপপ্রয়াস তিনি চালিয়েছেন। দুর্ভাগ্য যে, এ বক্তব্যে তিনি তার অসহায়ত্বের পরিচয় দিয়ে গেলেন। মূলত আহমদীয়া সম্প্রদায় বা অন্য কাউকে কাফির বলে সামাজিক ভাবে অবাঞ্চিত ঘোষণা করার চর্চা করা নিজেদের অন্ধ অনুসারীদেরকে নিজেদের দলে অন্ধভাবে আটকিয়ে রাখার জন্য প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই কি হতে পারে?

ইতিহাস বলে, বৃটিশ শাসনামলে আহ্‌লে হাদিসের প্রখ্যাত আলেম আবুল হোসেন বাটালবী সাহেবও এ ধরনের এক অসহায়ত্বের শিকার হয়েছিলেন। মুফতি কেফায়াতুল্লাহ সহ এদেশীয় একজন আলেম মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মৃত্যুর পর তারই দু'একটি লেখা পড়ে তার সম্পর্কে জানতে গিয়েছিলেন পাঞ্জাবে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবের বাড়ি যাওয়ার পথেই মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেবের নিকট। তিনি ছিলেন মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর পরিচিত। মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী ছিলেন তৎকালীন আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনের প্রধান ধর্মবেত্তা। তিনিই তার বন্ধু আলেমকে বলেছিলেন এই জাহেলের সম্বন্ধে জানতে কেন যাবে? সে তো কোনো লেখাপড়াই জানতো না। সে তো আবার মরেও গেছে। তার প্রতিউত্তরে তিনি বলেছিলেন তাহলে আপনার মতো এত বড় একজন আলেমকে তাকে পরাজিত করার জন্য সারাজীবন লড়তে হলো কেন? যদি তিনি লেখাপড়াই না জানেন। চুপ হয়ে গিয়েছিলেন বাটালবী। চিন্তাবিদদের মতে অন্ধ ভক্তদের নিজেদের দিকে ফিরিয়ে রাখার রাজনৈতিক ইসলামপন্থীদের মিথ্যা কৌশল এগুলো। আর এ মিথ্যা কৌশলের নিচেই লুকিয়ে আছে নির্যাতনের প্রতি আহ্বান করার এক সূক্ষ্ম উপাদান। অন্ধ অনুসারীরা সেই উপাদানের উপর ভিত্তি করে মুসলিম-বিশ্বে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে নির্যাতন করছে। আর এই নির্যাতনের পিছনে ধর্মবেত্তারা বলে বেড়াচ্ছেন যে তারা জড়িত নন। কিন্তু প্রকৃতির আদালতে এইসব ধর্মবেত্তারা কি সাফাই গাইবেন? বক্তব্যের প্রকৃতিতেই অন্ধ অনুসারীদের জন্য রয়েছে নেতার অঘোষিত নির্দেশ। মিথ্যাচারিতার মাধ্যমে অন্ধভক্তদের দলের দিকে ফিরিয়ে রাখার জন্য কৌশলে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে আর একটি সম্প্রদায়কে শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের পথ ধরে।

একইভাবে সম্প্রতি এক পীরসাহেব বলেছেন জামাতে ইসলাম কোনো ইসলামি দল নয়। জামাত আমেরিকার দালাল। বগুড়ার ১০৮ আলেমের বিবৃতি জামাতের বিরুদ্ধে সেই একই কথা - জামাতে ইসলাম কোনো ইসলামি দল নয়। বহু বৎসর পূর্বে গোলাম আযম সাহেব তার এক বক্তব্যে বলেছিলেন, মূলত এগুলো অন্ধ ভক্তদেরকে জামাতে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখার হীন কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। জোট সরকারের মন্ত্রীর মতো ব্যক্তিত্বের সেই রূপ হীন কৌশল অবলম্বন করাকে ধর্মভীরু দেশের ৭৫ ভাগ মানুষ কোন চোখে দেখছে এটা সহজেই অনুমেয়। রাজনৈতিক ইসলাপন্থীরা ধর্মের লেবাস পরে যখন ধর্মান্ধতার আশ্রয় নেন - হীনতার আশ্রয় নেন তখনই মনে হয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এঁর শান্তি (ইসলাম) ধর্ম কোনদিকে বাঁক নিচ্ছে।

এবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি রাজনৈতিক ইসলামপন্থীদের সাইয়্যেদ আবুল আলা মৌদুদি সাহেবের এক আচরণের প্রতি। তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রায় দুই হাজার প্রখ্যাত আলেমের দল তাকে অমুসলিম ঘোষণা করেছিলেন। কাফির বলেছিলেন। তার প্রিয়জনেরা তাকে তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, স্যার এদের উত্তর দিবেন না? তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানের আদম শুমারি লিষ্টেও যদি আমার নাম অমুসলিম বলে তালিকাভুক্ত করা হয় তাতেও আমি উদ্বিগ্ন নই আমার পরকালের মুক্তির ব্যাপারে। তবে যদি আল্লাহর আদমশুমারী তালিকার কোনো এক কোণায় আমার নাম মুসলিম হিসেবে লিখিত হয় সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর তিনিও একসময় আহমদীয়াদের কাফির প্রমাণ করার আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েন এবং স্ববিরোধী কাজ করে গেছেন।

বর্ণনাকারী রাবী যদি তার বর্ণনার বা রেওয়ায়েতের বিরোধী কর্মে জড়িত হন তবে মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় সেই বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি ন্যায়পরায়ণ রাবী সাব্যস্ত হন না।

বাংলাদেশের এক পীর সাহেবের বক্তব্য আমরা গত ১০ বছর থেকে শুনে আসছি। তিনি বার বার জামাতে ইসলামকে ইসলামের শত্রু বলে ঘোষণা দিয়েছেন। জামাত ইসলামি দলই নয় এটা তিনি বহুবার চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে আহবান জানিয়েছেন। জামাতে ইসলাম তার ডাকে কখনোই সাড়া দেয়নি। হাফেজী হুযুর মৃত্যুর আগে ১০০ আলেমের স্বাক্ষরযুক্ত ফতোয়াসহ লিফলেট বিলি করেছিলেন এই মর্মে যে, জামাতে ইসলাম ইসলামি দল নয়। এরা ইউরোপের দালাল। দেখুন এসবই ধর্মবেত্তাদের কাজ। জামাতী নেতা সেই একই পথ অবলম্বন করলেন নিরীহ আহমদীয়াদের ক্ষেত্রে।

পূর্ববর্তী ধর্মবেত্তাদের আস্ফালণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তৎকালীন দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রখ্যাত শায়খুল হাদিস হোসাইন আহমদ মাদানি সাহেব বলেছিলেন উর্দুতে, যার বঙ্গানুবাদ হলো - দেখো ভাই, মওদুদি কাদিয়ানী থেকেও অধিক খারাপ। পাঞ্জাব হলো মানব উত্থিত হবার স্থান। এখান থেকে কাদিয়ানী বের হয়েছে, এখন মওদুদি বের হয়েছে, ভবিষ্যতে আরো কত বের হবে সেটা খোদাই

জানেন। এই বাক্য কয়টি বাংলা, উর্দু, হিন্দি, ইংরেজী ভাষায় মাদানি ভক্ত হাজার হাজার প্রবীণ ও বর্তমান আলেমদের মুখে মুখে এখনো প্রচারিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক ইসলামপন্থী, ধর্মব্যবসায়ী ও সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অসংখ্য ধর্মান্ধ রয়েছে। আহমদীয়ারাও তার ব্যতিক্রম নয়।

মুহাম্মদী ইসলাম থেকে আমরা আজ দেড় হাজার বছর দূরে। দিব্যজ্ঞানের মাধ্যমে ধর্মের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে প্রকৃতির বা স্বভাবের পরিবর্তনের দিকে আমাদের ফিরে আসতে হবে। প্রকৃতির ধর্মই হলো সত্যের নিগূঢ় রহস্য। সেই সত্যের নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য সময় ও পরিবেশের সাথে সাথে উদ্ঘাটন করাই কুরআনিক মুসলিমের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটাই কুরআনে বলা হয়েছে - আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতিকে তোমরা আবশ্যক করিয়া ধরো যে প্রকৃতির উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন নেই। আর উহাই সুদৃঢ় দ্বীন। বর্তমানে আলেম, তালেবে এলম, ধর্ম শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে ধর্মান্ধতা রয়েছে তা অসংখ্য ধর্মীয় পুস্তক রচনার মধ্যে বিদ্যমান। সে জন্য সংশোধনের নিমিত্তে নিজেদেরকেই প্রথমে এগিয়ে আসা শ্রেয় অন্যকে দোষী করে নয়।

কাফির বলার প্রবণতা অনৈসলামিক এবং এ সম্বন্ধীয় কোনো বক্তব্য নিজের হীনতারই প্রমাণ। কুরআন-হাদিসের দলীলে এসব হীন কর্মকান্ড সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়েছে এবং সম্ভ্রান্ততার উচ্চমার্গের তালিম দেয়ার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

জামাতী নেতার বক্তব্যের একটা অংশের প্রতি পাঠককূলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দুঃখজনক হলেও সত্য তিনি তার বিবৃতিতে এমন একটি কথাও বলেছেন যার সারমর্ম হলো - কাদিয়ানীরা এখনো এতো অধিক হয়নি যে তাদেরকে লাঠি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের মা-বোনদের হামলা করতে হবে। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় তিনি হামলা করার পক্ষে। আহমদীয়াদের সংখ্যা বেড়ে গেলেই সেই হামলা বৈধ হবে। তাহলে যেসব ধর্মীয় উগ্রবাদীরা মনে করেন কাদিয়ানীদের সংখ্যা অনেক হয়ে গেছে তারা তাদেরকে লাঠি দিয়ে প্রতিরোধ করবেই। অপর এক ধর্মবেত্তাও ঠিক একই কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, কাদিয়ানীদেরকে ছোটো করে দেখা মোটেই ঠিক হবে না। আমাদের মনে রাখা দরকার প্রত্যেকটা মানুষ একেকটি সংগঠক ও প্রতিষ্ঠান। অগণিত অসংখ্য প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরা এসব এলোমেলো বক্তব্যগুলো থেকে ধর্মীয় সীমা লজ্ঞনের মাধ্যমে সমাজে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে সে দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে? রাজনৈতিক ইসলামপন্থী ধর্মবেত্তারা কি এর উত্তর দিতে পারবেন?

কুরআনের একটি আয়াত - নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদি হয়েছে এবং সাবীগণ ও নাসারাগণ যে কেউ ঈমান আনে আল্লাহ্র উপর এবং শেষ দিনের উপর এবং যোগ্য হয়ে কাজ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই। তাদের উদ্বিগ্নতাও থাকবে না (সূরা মায়েদা)। এখানে ইহুদি নাসারা যে দুটি সম্প্রদায় কুরআনের পাঠকদের নিকট বেশি পরিচিত সে দুটি ছাড়া অন্য একটি সম্প্রদায়ের কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ সাবীগণ। এ সাবীগণ অপরিচিত। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের ঐশীগ্রন্থধারীদেরকেই আমরা নির্দ্বিধায় এ শব্দ দ্বারা বুঝে নিতে পারি। অর্থাৎ যারাই বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতার সাথে কাজ করবে তাদের পুরস্কার নিশ্চিত করা হয়েছে। এটাই তো যে কোনো জাতির প্রগতির প্রাথমিক পদক্ষেপ। আউলিয়াদের শানেও ঠিক একই কথা বলা হয়েছে - তাদের কোনো ভয় নেই তারা উদ্বিগ্নও থাকবে না। অন্য আরেকটি আয়াত - যদি তারা তাওরাত ও ইঞ্জিল এবং তাদের প্রভূর নিকট থেকে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা দাঁড় করাতো তাহলে তারা তাদের উর্দ্ধদেশ থেকে এবং তলদেশ থেকে ভক্ষণ করতে পারতো (সূরা মায়েদা)। আজকের যুগে আমরা দেখছি ইহুদি ও খৃষ্টান সম্প্রদায় অধিক ভক্ষণ করছে। মাটির নিচের খণিজ সম্পদও তারাই জ্ঞান অন্বেষণের মাধ্যমে সংগ্রহ করছে। আকাশ থেকে সেই একই জ্ঞান তারাই অর্জন করছে।

এসব আয়াত থেকে বিশ্ববাসীকে এক কাতারে দেখার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সবাই মুক্তিপ্রাপ্ত হতে পারে যদি তারা বিশ্বস্ত আর যোগ্য হয়। অন্যত্র বলা হয়েছে - হে যারা ঈমান এনেছো কোনো সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে। তারা ওদের থেকে উত্তম হতে পারে। নারীরাও যেন অন্য নারীদেরকে বিদ্রূপ না করে। ওরা তাদের চাইতেও উত্তম হতে পারে এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না। একে অপরকে অবজ্ঞাসূচক উপনাম দিয়ে ডেকো না। ঈমান আনার পর দোষণীয় নাম বড়ই নিন্দনীয়। এবং যারা এর পর তওবা করবে না তারাই জালেম। এখানে কোনো সম্প্রদায়কে হীনভাবে সম্বোধন না করার আদেশ দেয়া হয়েছে। অনেকে বলে থাকেন এখানে ঈমানদারদের মাঝে পরস্পর পরস্পরের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এখানে কিন্তু তা বলা হয়নি। শুধু সম্প্রদায় বলা হয়েছে। তোমাদের মাঝে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে এরূপ করবে না তা বলা হয়নি। যদি কেউ এরূপ বুঝেও থাকেন তবুও তিনি আরো মহান হতে পারেন। যেখানে নিজেদের মাঝে হীন সম্বোধন নিষেধ করা হয়েছে সেখানে অন্য সম্প্রদায়কে হীন সম্বোধন করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

আজকের বাংলাদেশের ধর্মান্ধ উগ্রবাদী মুসলমানদের বক্তব্য ও আচরণে সারা পৃথিবী বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছে। আহমদীয়া সম্প্রদায়কে যদি কেউ মুসলমানই মনে না করেন সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু তাই বলে তাদেরকে হেয় ভাবে সম্বোধন করার কোনো অধিকারই কুরআন কাউকে দেয়নি। পৃথিবীর কোনো সভ্য লোক এ কাজ করতে পারে না। কোনো ভাবেই তাদেরকে নিয়ে হীন মন্তব্য করার মজলিস বা বৈঠক বা সম্মেলন উম্মতে মুহাম্মদীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এটা চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য সত্যই লজ্জাজনক ব্যাপার প্রকৃতিগত ভাবেই। তবে ফেতরাত বা প্রকৃতি খারাপ হয়ে গেলে তো কোনো কথাই নেই।

এবার হাদিসের আলোকে এসব অবাঞ্চিত কর্মের অবস্থান কোথায় দেখুন। আনাস থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেছেন রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ঈমান এর মূল বিষয় ঃ যে ব্যক্তি বলেছে - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কিন্তু বাকি অংশ রপ্ত করেনি তার থেকে বিরত থাকো। তাকে কোনো গুনাহের কারণেই কুফর দ্বারা সম্বোধিত করো না। এখানে মুহাম্মদ (সাঃ)-এঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি। কেউ হয়তো বলবেন মুহাম্মদের (সাঃ) উপর ঈমান আনার বিষয়টি এখানে উহ্য আছে। রাসুলতো বলেননি বরং রাসুল এখানে উদারতার শিক্ষা দিয়েছেন। রাজনৈতিক ইসলামপন্থী ও ধর্মবেত্তারা কেন সেই উদারতার শিক্ষা গ্রহণ করবেন না? কাউকে কাফির বলার মধ্যে কি রহস্য আছে? অপর একটি হাদিসে বলা হয়েছে কে কাফির আর কে কাফির নহে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের জিম্মায়। 'যে ব্যক্তি আমাদের সালাত করে এবং আমাদের কেবলাকে সামনে রাখে এবং আমাদের জবাই করা মাংস খায়, সে মুসলিম। সে আল্লাহ্র জিম্মায় এবং তাঁর রাসুলের জিম্মায়।' এখন প্রশ্ন আল্লাহ্র জিম্মায় ধর্মান্ধরা নাক গলাতে যাচ্ছেন কেন? আজকে মুসলমানরা এসব মহান শিক্ষা উপলব্ধি করতে অক্ষম কেন? পাকিস্তানে আহমদীয়াদের উপর নির্যাতনের ফল হয়েছে আহমদীয়া সম্প্রদায় আজকে পাকিস্তানের সবচেয়ে সভ্য পরিশ্রমী সম্প্রদায়। তারাই আজ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয়কারী। নির্যাতিত হওয়ার কারণে বিশ্বব্যাপী মানবতাবাদী রাষ্ট্রে তারা সমাদৃত। আর বিভিন্ন দেশের ধর্মান্ধ জুব্বাধারী রাজনৈতিক ইসলামপন্থীরা সন্ত্রাসী নামে বিশ্বে পরিচিত হচ্ছে। এটাই জালিম আর মাজলুমের মধ্যে তফাৎ।

যা হোক কাফের বলার কোনো ক্ষমতাই আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলের ইসলামের শিক্ষায় নেই। এছাড়া ইমাম আবু হানিফা বলেছেন কোন

ব্যক্তির কথায় যদি এক দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমানী ব্যাখ্যা করা যায় আর নিরানব্বই দৃষ্টিকোণ থেকে কুফরী ব্যাখ্যা করা যায় তবে ঈমানী ব্যাখ্যাটি নিতে হবে। এরপরেও চিন্তার অবকাশ আছে যে, কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে - তারাই কাফির, তারাই জালিম, মুশরিক, ফাসিক ইত্যাদি। বিষয়গুলো খুবই গভীর উপলব্ধির বিষয়। দিব্যজ্ঞানী চিন্তাবীদগণই একমাত্র শব্দগুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে ইতিহাস প্রমাণ দেয়। কুরআন বলছে - হে প্রশান্ত প্রাণ, তুমি তোমার প্রভূর দিকে ফিরে আসো যে অবস্থায় তুমিও তোমার প্রভুতে সন্তুষ্ট আর তিনিও তোমার উপর সন্তুষ্ট। বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন সময়, পরিবেশ ও ব্যক্তি অবস্থানকে কেন্দ্র করে কাফির, মুশরিক, ফাসিক ইত্যাদিতে সম্বোধন করার অর্থই হলো যাতে সমগ্র মানবজাতি নিজেদের কর্মকান্ড নিয়ে সতর্ক থাকে। কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে গালাগালি দেওয়ার জন্য নয় বলে ইসলামি চিন্তাবিদগণ বিশ্বব্যাপী অভিমত ব্যক্ত করেছেন ও করছেন। ইসলামে কোনো গীবত, গালাগালি, হীন নামে ডাকাকে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে, যেহেতু এগুলো সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনে। শান্তি (ইসলাম)-এ কঠোর ভাবে এই বিপর্যয়কে ঠেকানোর উপাদান দেয়া হয়েছে। তাই মুসলমানদের কুরআনকে গভীর উপলব্ধির মাধ্যমে আঁকড়ে ধরতে হবে। কুরআনে বার বার বলা হয়েছে - যদি তারা উপলব্ধি করতে পারে তবেই তারা সফলকাম। মোট কথা কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে কোনো গালাগালি করা কখনো ইসলাম প্রশ্রয় দেয় না। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মনে হচ্ছে উগ্র ধর্মান্ধরা ক্ষমতার লোভে আল্লাহ্ আর তাঁর রাসুলের আসন দখল করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন!
ভাবতে অবাক লাগে যে, মুসলমানরা কি করে এই হীন ফতোয়াবাজিতে পতিত হলো? সর্বশেষে ধর্মান্ধ রাজনৈতিক ইসলামপন্থী, ধর্মব্যবসায়ী ও ধর্মবেত্তারা কাফির ফতোয়া দেয়ার হীন চর্চা থেকে বিরত থাকবেন, বাংলাদেশে শান্তি (ইসলাম) রক্ষার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করবেন এবং মজলুম সম্প্রদায়গুলো স্বাধীনভাবে স্ব স্ব বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যাতে বাংলাদেশব্যাপী শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠায় ও সার্বিক প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার দিক নির্দেশনা দেবেন এটাই জাতির প্রত্যাশা।
বাংলাদেশের আপামর জনতা ভালো করেই জানে শান্তি (ইসলাম) কি। মিথ্যাচার করে, অপব্যাখ্যা দিয়ে দেশের অগ্রগতি সাময়িক স্থগিত করা যাবে সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। কিন্তু তারপর কি হবে.......... কি হবে সময়ই বলে দেবে এবং একমাত্র আল্লাহ্ই তা ভালো জানেন!!! ❑